শতবর্ষের শেষে

ডাঃ নিরঞ্জন হালদার

পুনশ্চ

লেখকের কথা

প্রথমে বলে রাখি আমি পণ্ডিত বা সাহিত্যিক নই, বিশ্বসাহিত্য দূরে থাক, বাংলা সাহিত্যেও আমার জ্ঞান খুব কম। নিতান্ত ছাপোষা চিকিৎসক আমি, সারাদিন দাগ - চুলকানির ব্যবস্থাপত্র লেখায় ব্যস্ত থেকে সন্ধ্যার অবসরটুকু তাস-পাশা-নেশার আসরে নষ্ট না করে, কষ্ট করে কিছু লেখা-লিখির চেষ্টা করি। অনেক লেখক নাকি আড্ডার গাড্ডা থেকে মণিমুক্তা তুলে আনেন, আমি তেমন ডুবুরী বা জহুরী নই। আবার নেশাহীন নীরস ব্যক্তি বলে সধূম-সরস আসরগুলি থেকে সর্বদা দূরে থাকি। সেখান থেকে রস আহরণ বা হরণ করে সাহিত্যে পরিবেশন করাও আমার সাধ্য নয়।

এই উপন্যাসটি আমার অল্প বয়সের কল্পনা বিকাশের গল্পকথা, ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। যখন আমার বয়স সতেরো, তখন সামনে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার বিশাল বৈতরণী, বইখাতার পাহাড়ের তলায় বিদ্যাদেবীর হাঁসের মত হাঁসফাঁস অবস্থা আমার মনের; একটু অবকাশ পেলে সে কল্পনার আকাশে ডানা মেলার চেষ্টা করত, তারই প্রকাশ এই উপন্যাসের পরিকল্পনা। কালক্রমে সেই কাল-পরীক্ষাও শেষ হয়ে গেল। কোনো গুরু (গৃহশিক্ষক) বা গরুর লেজ না ধরে অকাতরে নিজে সাঁতরে সেই বৈতরণী উতরে গেলাম। কূল পেলাম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ডেরায়। সেখানে অনেকে ডরালেও আমি হাড়গোড়ে গড়াগড়ি দিয়ে রোগীদের নিত্য রাগারাগির মধ্যে রুগ্ন হয়েও কেমন করে যেন চিকিৎসক হয়ে বের হওয়ার পরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমার চর্মের বিশেষ চর্চা করে ঘষে মেজে আমাকে বিশেষজ্ঞ ঘোষণা করে বিদায় দিলে। আমি তখন সেখান থেকে সরে এসে নিজেকে সরাসরি সরকারী চাকরির চাকায় বেঁধে ফেললাম।

কতগুলো বছর চলে গেছে! ছাত্র জীবনের বন্ধুরা কে কোন ছত্রছায়ায় চলে গেছে, আর আমার বোকাবোকা পাণ্ডুলিপিটি পোকায় কেটে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেছে। ক্রমে পেশার চাপে পিষ্ট হওয়া আমার মন আবার অর্থ-অনর্থের কানাগলিতে পড়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা সয়ে ডানা ঝটপটিয়ে উঠল। তাই সেটাকে নিয়ে আবার নাড়াচাড়া করে একটা উপন্যাস খাড়া করতে লেগে পড়া গেল। কিন্তু সেই অপরিণত বয়সের লেখা, দেখা গেল - ভাষা তার ভাসাভাসা, ভাবে রয়ে গেছে পরিণত ভাবনার অভাব, গল্পে রয়ে গেছে রূপকথা কল্পকাহিনীর অল্প ছোঁয়া। রাজা-রাজকুমারী, যুদ্ধ বিদ্রোহ, ধর্মীয় বিবাদ-বিতর্ক ইত্যাদি রয়ে গেছে সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমানের পরিবেশে তার মান বেশ মান্ধাতার আমলের বলে মনে হবে। যদিও কাহিনীর সময়কাল বঙ্গেশ্বর শশাঙ্কের মৃত্যুর পর শতবর্ষের অরাজকতার শেষের দিকে, বর্তমান কালের নয়, তবুও একে ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি পরিশ্রমী সাধারণ মানুষেরাই সমাজের চালিকা শক্তি, তারাই সবকিছু সৃষ্টি ও বিবর্তনের নায়ক নায়িকা, রাজা-রাণী-রাজকুমার-রাজকুমারীরা নয়। কিন্তু তরুণ বয়সের কল্পকথা বলে এই উপন্যাসে তারাই নায়ক নায়িকা হিসেবে রয়ে গেছে। পাঠকেরা এই দুর্বলতাকে ক্ষমা করে দেবেন সেই আশা রাখি।

"আলোর ঠিকানা"
শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি।
দূরভাষ ঃ ৯৪৩৪৪১১০১৩

লেখক -
ডাঃ হালদার

শতবর্ষের শেষে

" উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য-বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তং কবয়ো বদন্তি।।"

॥ প্রস্তাবনা ॥

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের অস্পষ্ট জোৎস্নায় সামনে প্রবাহিত বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্র অস্পষ্ট দেখা যায়। পূর্ব আকাশে আলোর আভা এখনো দেখা দেয় নি। ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটি শ্মশানভূমির পাশে কোন এক অজানা বৃক্ষের তলায় পাশাপাশি বসে দুটি তরুণ - আনন্দ ও কল্যাণশ্রী।

আনন্দ শোকার্ত, আনন্দ বিহ্বল। গত সন্ধ্যায় আনন্দের পিতা আচার্য দৈত্যবিষ্ণুর মৃত্যু হয়েছে। দাহ ও শেষকৃত্যের পর শ্মশানযাত্রী গ্রামবাসী ও আচার্যের সহকর্মী ও ছাত্ররা সবাই আবছা জ্যোৎস্না-আলোকিত পথে নিজেদের গ্রামে ফিরে গেছে। আনন্দকে তারা সাথে নিয়েই ফিরতে চেয়েছিল, কিন্তু আনন্দ একটু একা থাকতে চেয়ে এখানে রয়ে গেছে। মৃতের পুত্রকে নাকি শ্মশানক্ষেত্রে একা ছাড়তে নেই, তবে তার বন্ধু কল্যাণশ্রী সঙ্গে আছে বলে তারা ভরসা পেয়ে ফিরে গেছে।

কল্যাণশ্রী আনন্দকে কখনও এমন দেখে নি। পূর্ব সমতটের ছোট এক রাজ্য, বিক্রমপুরের রাজপুত্র কল্যাণশ্রী প্রখ্যাত আচার্য দৈত্যবিষ্ণুর কাছে ছাত্র হিসেবে শিক্ষা লাভের জন্য এখানে এসেছে। আচার্য দৈত্যবিষ্ণুর একমাত্র পুত্র আনন্দ তার সমবয়সী ও সতীর্থ। এই দীর্ঘ চার বছরে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক গভীর বন্ধুত্ব। তাই পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত আনন্দকে সান্ত্বনা দিচ্ছে কল্যাণশ্রী, -'আনন্দ, আমার মতে এটা উপনিষদের সারমন্ত্র। গুরুদেব বয়সে বৃদ্ধ হয়েছিলেন, রোগে বা অপঘাতে তাঁর অকালমৃত্যু হয় নি। তাই তাঁর এই স্বাভাবিক মৃত্যুতে শোক কিসের? তোমাকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন তিনি। আর কর্তব্য শেষে আনন্দ-ব্রহ্মে বিলীন হয়েছেন। তাঁর জন্য শোক করো না। ওঠো, জাগো, অনেক কঠিন পথ তোমাকে এগোতে হবে, অনেক বড় হতে হবে, আনন্দ।"

আনন্দ নীরব, সম্মুখে বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্র কলকল শব্দে প্রবাহিত। কল্যাণশ্রীর কথাগুলি যেন তার অন্তরে সাড়া জাগায় নি। অসীম আকাশের অন্ধকারে অসংখ্য তারারা মিটমিট করে আলো নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আনন্দ তাই পাশে বসা কল্যাণশ্রীকে যেন দেখতে পাচ্ছে না।

কল্যাণশ্রী আবার বলল,-"আনন্দ, জীবন অনিত্য, মৃত্যু জীবের ধর্ম, মৃত্যু অবধারিত। মোহময় এই শরীর চিরকালের ব্যবহারের জন্য নয়। চীরের মতো তা যখন জীর্ণ হয়ে যায় তখন তাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করতেই হয়। মায়াময় এই পৃথিবীতে সবটুকুই তো অনিত্য। আমরা শুধু মোহের জন্য শোক করি। আমি কি ঠিক বলছি না, আনন্দ?"

আনন্দ তবুও নীরব। তার এই নীরবতা কল্যাণশ্রীর ভালো মনে হলো না। সে আনন্দের হাত ধরে একটু নাড়া দিল।

আনন্দ গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে হঠাৎ যেন জেগে উঠল। একটা নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলল,-"কল্যাণ, শ্মশান ভূমিতে এসে আমরা অনেকে সহজেই দার্শনিক হয়ে উঠি। একটা মৃত্যু দেখে ভাবি জীবন অনিত্য। কিন্তু অনিত্য জীবনকেই আমরা সার্থক করে তুলতে চাই। এই মোহময় দেহ ধরেই আমরা বাঁচতে চাই। তাই একজন নিকট আত্মীয় মারা গেলে আমরা এই নিন্দনীয় মোহময় দেহ ত্যাগ করে, মায়ার সংসারকে ঘৃণা করে আত্মবিসর্জন দিই না। বরং আমরা সবাই আবার যে যার ঘরে ফিরে যাই, বাঁচতে চাই ইহলোকে, এই প্রাণেভরা পৃথিবীতে।"

কল্যাণশ্রী বলল, -"তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়া আমার সাধ্য নয়। সত্যিই আমরা জীবনকে ভালোবাসি। এই পৃথিবীতে সবার মধ্যে, আপনজনেদের মধ্যে ভালবাসা পেয়ে আমরা বাঁচতে চাই।"

আনন্দ বলল, -" ঠিক বলেছো কল্যাণ, সবার মধ্যে, আপনজনেদের মধ্যে আমরা বাঁচতে চাই। কিন্তু সবার মধ্যে আমি যে বড় একা হয়ে গেলাম কল্যাণ, আপনজন আর তো কেউ রইলো না।"

"একা কেন হবে আনন্দ? তোমার পিতা চলে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁর সহযোগী অনেক আচার্য তো রয়েছেন। তাঁরা এক একজন এক একটি নক্ষত্রের মতো, তুমি তাঁদের মাঝে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠবে।"- কল্যাণশ্রী বললো।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আনন্দ বলল, -"ঠিকই বলেছো কল্যাণ- এই অন্ধকার রাত্রিতে শ্মশান ভূমিতে বসে অন্ধকার মহাকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, ওই মিট মিট করে জ্বলতে থাকা তারাদের সাথে আমি যেন একাত্ম, অথচ তুমি জানো তারারা পরস্পর কত দূরে দূরে। আমি যে ভীষণ একা হয়ে যাব- নাম পরিচয়বিহীন, একেবারে একা।"

"নাম পরিচয়বিহীন কেন?" - কল্যাণশ্রী অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

আনন্দ ধীরে ধীরে বলল, -"কল্যাণ, তোমার কি কখনো মনে প্রশ্ন জাগে নি যে, আচার্যদেব বয়সে বেশ বৃদ্ধ আর তাঁর পুত্র আমি এতো তরুণ কেন? তা ছাড়া তাঁর দেহবর্ণ বা মুখের গঠনও আমার চেহারার সঙ্গে ততোটা মেলে না।"

এবার কল্যাণশ্রী একটু সময় নিয়ে উত্তর দিল, -"এই প্রশ্ন আমার মনেও ছিল। তোমরা দীর্ঘকায়, অনার্য বঙ্গবাসীদের মতো নও। তাই গ্রামবাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছে

খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, তোমার পিতা একদিন প্রভাতে তোমাকে নিতান্ত শিশু অবস্থায় সঙ্গে নিয়ে এক নৌকায় করে নদীপথে ত্রিস্রোতা - ব্রহ্মপুত্রের মিলনস্থল এই গ্রামে উপস্থিত হন। গ্রামবাসীরা তাঁর আচার্য পরিচয়ে খুশি হয়ে আশ্রয় দেয় এবং শিক্ষা আশ্রম গড়তে সাহায্য করে। গ্রামের একজন সদ্যসন্তানবতী নারী তোমার মতো দুধের শিশুকে বুকে তুলে নেন ও বড় করে তোলেন। এইসব তুমি নিশ্চয় জেনেছো বা তোমার পিতার কাছে শুনেছো।"

আনন্দ একটু নীরব থাকার পর একটা বড় নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলল, - "তিনি আমার পিতা ছিলেন না।"

কল্যাণশ্রী হতবাক। আনন্দের দুহাত জড়িয়ে ধরে সে বললো, -"কি বলছো তুমি? তাহলে তিনি তোমার কে হন? তুমি কার পুত্র?"

"এ প্রশ্ন তো আমারও" - আনন্দ ধীরভাবে বলে যেতে লাগল, - "গতকালই সবে জেনেছি যে, আমি তাঁর পুত্র নই। দুদিন অজ্ঞান থাকার পর সন্ন্যাস রোগে গত সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়, একথা সকলেই জানে। কিন্তু নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ যেমন একবার দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি একটু সময়ের জন্য তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমার দিকে কেমন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তারপর আড়ষ্টভাবে বলতে থাকেন যে, আমি তাঁর পৌত্র, পুত্র নই। তিনি আচার্য হলেও তাঁর পুত্র ছিলেন যোদ্ধা। যুদ্ধেই তাঁর অকাল মৃত্যু হয়। ভয়ে শোকে পিতামহ আমাকে আর আমার জননীকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে নৌকা নিয়ে ত্রিস্রোতা নদীতে ভেসে পড়েন। মাঝ নদীতে আমার জননী নাকি আমাকে পিতামহের কোলে শুইয়ে দিয়ে হঠাৎ নদীর অকুল আঁধার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন দেন। অন্ধকারে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি, - এই পর্যন্ত বলেই তাঁর বাক্যরোধ হয়ে যায়, তিনি কেবল তাকিয়ে থাকেন। তাঁর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। তারপর হঠাৎ তাঁর চোখের জ্যোতি ম্লান হয়ে যায়। কল্যাণ, আমার পিতা মাতা কে, আমি তা কিছুই জানি না।"

একটু সময় দু'জনে নীরব, তারপর কল্যাণশ্রী ধীরে ধীরে বলল, - "তোমার পিতা মাতার পরিচয় তিনি বলে যান নি, তিনি কেন এখানে পালিয়ে এসেছিলেন তাও কেউ জানে না। কিন্তু, কেন তিনি তোমার পরিচয়, তোমার পিতার পরিচয় কাউকে জানান নি? কেন? যুদ্ধে তো অসংখ্য যোদ্ধার মৃত্যু হয়, কিন্তু তাদের পরিবার শোকার্ত হলেও ভীত হয় না বা পালিয়ে বেড়ায় না। তবে কি তোমার পিতা কোন রাজা বা রাজপুরুষ ছিলেন - যে তাঁর বংশধর হিসেবে তোমাকে বাঁচাতে আচার্যদেবের এই পালিয়ে আসা, এই গোপনীয়তা?"

আনন্দ বলল, - "এই শোকের মধ্যে তোমার কথায় আমার হাসি পাচ্ছে। তুমি আমার বন্ধু এবং তুমি রাজপুত্র, তাই আমাকেও তোমার সমান একজন কাল্পনিক রাজপুত্র বানাতে চাইছো। এর কোন সম্ভাবনা নেই। পিতামহ তো গেলেন। যাবার আগে আমার পিতা মাতার অকাল মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে গেলেন। একই সঙ্গে নিকটতম এই তিনজনের

মৃত্যুশোক আমাকে একা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। বিশাল এই পৃথিবীতে আজ আমি একা।"

কল্যাণশ্রী তার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বলল, -"তুমি একা নও আনন্দ, আমি আছি তোমার বন্ধু। আমি তোমার সঙ্গেই আছি।"

"তুমি আর ক'দিন আমার সঙ্গে থাকবে কল্যাণ?"-আনন্দ ধীরে ধীরে বলল-"তোমার তো এখানে শিক্ষার শেষ ঘোষণা হয়ে গেছে। তোমার পিতার পাঠানো রক্ষী সহ কিছু রণতরী গুরুদক্ষিণা নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে এখানে পৌঁছাবে শুনেছি। তোমাকে তো তোমার পিতার কাছে কয়েকদিনের মধ্যে ফিরে যেতে হবে। তাছাড়া হয়তো ফিরলেই তোমাকে যুবরাজ হিসাবে অভিসিক্ত করা হবে। তারপর কোন সুন্দরী রাজকন্যা দেখে মহাসমারোহে তোমার বিবাহ দেওয়া হবে। তুমি কেমন করে আমার সাথে থাকতে পারবে, কল্যাণ?"

"এত অভিমান?" - কল্যাণশ্রী বলল, - "পিতার আদেশে আমি যুবরাজ হতে রাজি হব, এই শর্তে যে- এখনই আমি বিবাহ করব না। এই ব্রহ্মপুত্রের কুলে এই শ্মশানভূমিতে বসে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, তোমার অনুরোধ ছাড়া, বলতে কি তুমি নিজে থেকে আমার বিবাহের ব্যবস্থা না করলে আমি কখনো বিবাহ করবো না।"

"অত আবেগতাড়িত হয়ো না কল্যাণ," - আনন্দ বলল, -"এই রকম প্রতিজ্ঞার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি আমার বন্ধু থাকলেই আমি জানবো- এই পৃথিবীতে আমার অন্ততঃ একজন নিজের কেউ আছে। ওঠো কল্যাণ, পূবের আকাশ আস্তে আস্তে আলোকিত হয়ে উঠছে। এসো, আমরা ব্রহ্মপুত্রে স্নান করে গ্লানি মুক্ত হই,- তারপরে আশ্রমে ফিরি"।

দুজনে হাত ধরাধরি করে সামনে এগিয়ে চলল।

॥ ত্রয়ী ॥

ব্রহ্মপুত্র ভারতের এক শ্রেষ্ঠ এবং সর্ববৃহৎ নদ। হিমালয়ের উত্তরে তুষার বিগলিত মানস সরোবর ও তার আশেপাশের বিস্তৃত তুষার আচ্ছাদিত অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে এই নদ নানা উপত্যকা গিরিখাত ধরে এঁকে বেঁকে ভারতে প্রবেশ করে বিরাট বিস্তার লাভ করেছে। কামরূপ ও বঙ্গদেশের ইতিহাসে এই নদ নানা ঘাতে প্রতিঘাতে জড়িয়ে আছে।

উষাকাল। ঝোপে ঝাড়ে এখনও আবছা অন্ধকার রয়ে গেছে, দিনের আলো এখনো পুরোপুরি ফোটে নি। সূর্য্যদেব এখনো পূর্ব আকাশে দেখা দেন নি। দুটি তরুণ হাত ধরাধরি করে উঁচু পাড়ের থেকে ব্রহ্মপুত্রের বিস্তৃত জলরাশির দিকে নেমে এল। এখনও কোথাও জনমানবের দেখা নেই। নদে এখনও কোন বড় তরনী এমন কি ছোট নৌকারও আনাগোনা শুরু হয় নি।

দুজনে ধীরে ধীরে জলে নামল, হাঁটুজল - কোমর জল, তারপর সূর্য্য প্রণাম করে দু'তিনটি ডুব। জোয়ার আসছে, জল বাড়ছে। দুজনে সাঁতারে দক্ষ - তীর বরাবর কিছুদূর পর্যন্ত সাঁতার কেটে চললো তারা। আনন্দ একটু দুরে সাঁতরে যাচ্ছিল, কল্যাণশ্রী তাকে ব্রহ্মপুত্রের অতল গভীর স্রোতে ঘুর্ণীর বিষয়ে সাবধান করে উচ্চস্বরে কূলের দিকে ডাকতে থাকল। তার মনে হল এই ত্র্যহঃস্পর্শ শোকের সময় আনন্দ তার জননীর মত ব্রহ্মপুত্রে আত্মবিসর্জন না দিয়ে দেয়।

এমন সময় কোথা থেকে একটি ছোট নৌকা যেন হঠাৎ ভাসতে ভাসতে আনন্দের কাছে চলে এলো। তাতে কোন মাঝি বা আরোহীর দেখা পাওয়া গেল না। নিতান্ত বড় একটা কাঠের টুকরোর মতো অনিয়ন্ত্রিত ভাবে সেটা ভেসে যাচ্ছে। আনন্দ সাঁতরে এগিয়ে গিয়ে নৌকাটির এক প্রান্তের রশি ধরে ফেলে টানতে টানতে সাঁতরে কূলের দিকে নিয়ে আসতে থাকলো। কূলের কাছে এলে কল্যাণশ্রীও হাত লাগালো, - ধাক্কা দিয়ে কিছুটা মাটির উপরে তুলে অন্যদিক জলের উপর ভাসানো অবস্থায় আটকে ফেলল।

হঠাৎ আনন্দ বলল,- "নৌকায় একজন মানুষ! দেখ তো কল্যাণ।"

সত্যিই তো, কল্যাণশ্রী দেখল, ঘাড় উল্টিয়ে কেউ একজন নৌকার কাঠের পাটাতনে শুয়ে আছে। মৃতদেহ নয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস বজায় আছে। মুখের একপাশে রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। বোধ হয় কোন আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে, নতুবা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বয়সে তরুণ, তাদেরই সমবয়সী হবে। বেশ গৌর বর্ণ লম্বা চওড়া দেহ, গায়ে দামী যুদ্ধের পোশাক, কটিবন্ধে কোষবদ্ধ তরবারি।

তাকে দুহাতে নাড়া দিয়ে, এমনকি উল্টিয়ে চিৎ করে ফেলেও তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আনন্দ দুহাতে করে জল নিয়ে তার চোখে মুখে ঝাপটা দিল, কোনও ফল হলো না।

আনন্দ তার জলে ভেজা উত্তরীয় দিয়ে তরুণটির মুখের পাশের শুকনো রক্ত চিহ্নগুলি মুছিয়ে দিয়ে বলল,-"এসো কল্যাণ, একে তুলে আমরা আমাদের আশ্রমে নিয়ে যাই। একে বাঁচাবার চেষ্টা করা যাক।"

কল্যাণশ্রীকে বলার দরকার ছিল না। দুজনে পাঁজকোলা করে ধরে অজ্ঞান তরুণটির লম্বা চওড়া বিরাট দেহটি তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে সাবধানে পাড়ে উঠল। তারপর যথা সম্ভব দ্রুত বহন করে আশ্রমে ফিরল।

ততক্ষণ ভোরের আলো ফুটেছে। দু'একজন আশ্রমবাসী প্রাতঃকৃত্যে বা প্রাতভ্রমণে বেরিয়েছে। তাই তারা ইচ্ছে করে পিছনের রাস্তা দিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করার ফলে পথে এদের সঙ্গে কারো সাক্ষাৎ হলো না। তারা দু'জন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে রাজপুত্র কল্যাণশ্রীর ঘরের মধ্যে তারই শয্যায় শুইয়ে দিল। কারণ, আজ আনন্দের ঘরে অনেকে আসবেন সান্ত্বনা দিতে বা যথা কর্তব্য আলোচনা করতে। অজ্ঞাত একজন কাউকে আশ্রমে এনেছে তা দেখিয়ে তারা চাঞ্চল্য ছড়াতে চাইছিল না। তারা দুজনে